পঞ্চম অধ্যায়

জৈন নীতিবিদ্যা
(Jaina Ethics)

জৈন দর্শন মূলত মোক্ষশাস্ত্র। অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতো জৈনরাও আত্মার বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করেন। আত্মা স্বরূপত বিশুদ্ধ হলেও দেহের সংযোগে আত্মা বদ্ধ হয়। এই সংযোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং তার ফলে জীবের মুক্তি হয়। জৈন দর্শনকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হলেও মোক্ষলাভের যে পন্থার কথা এই দর্শনে বলা হয়েছে সেটি নৈতিক। বিভিন্ন ব্রত বা অনুশাসন পালনের মধ্য দিয়ে জীব তার মুক্তির পথ রচনা করে। জৈন দর্শনে নীতিবিদ্যার গুরুত্বকে বুঝতে হয় তাদের পরাতত্ত্বের পটভূমিতে। তাই জৈন নীতিবিদ্যার আলোচনার জন্য তাদের অধিবিদ্যা বা পরাতত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন।

দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগকেই জৈন দর্শনে বন্ধন বলা হয়েছে। জৈন মতে কর্মের মাধ্যমেই আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সত্যজ্ঞানের অভাব, ক্রোধ, লোভ, মান, মায়া প্রভৃতি কষায় বশত কর্ম পুদ্গল আত্মায় প্রবেশ করে। আত্মায় কর্ম পুদ্গলের এই প্রবাহকে বলে **আস্রব**। যে অবস্থায় কর্ম পুদ্গল আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয় তার নাম **বন্ধন**। জল যেমন দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডের সঙ্গে মিশ্রিত হয় সেইরকম কর্ম পুদ্গল আত্মার সঙ্গে মিশ্রিত হলে জীবের বন্ধন হয়। সম্যক বিশ্বাস, সম্যক জ্ঞান প্রভৃতি কর্ম পুদ্গলের এই প্রবাহকে রুদ্ধ করে। এই অবস্থার নাম 'সম্বর'। তারপর আত্মায় সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হয় যার নাম 'নির্জরা'। যখন কর্ম পুদ্গলের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয় তখন আত্মা কর্মের সংস্রব থেকে বিমুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে বিরাজ করে। জীবের এই অবস্থার নাম 'মোক্ষ'। জৈন নীতিবিদ্যায় যে সমস্ত অনুশাসনের উল্লেখ আছে তারা আত্মার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

জৈন নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হল জীবের বন্ধন মোচন। স্বভাবতই এই নীতিবিদ্যার

প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার জন্য তিনটি বিষয়ের বিশদ ধারণা থাকা প্রয়োজন— জীবের স্বরূপ, বন্ধন ও তার কারণ এবং মুক্তির স্বরূপ। এই ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করার পরেই জৈনদের নীতিবিদ্যা আলোচনা করা যেতে পারে।

জীব— জৈন অধিবিদ্যার মূল তত্ত্বের নাম 'দ্রব্য'। দ্রব্যকে প্রথমত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে— অস্তিকায় এবং অনস্তিকায়। যে দ্রব্য দেশে পরিব্যাপ্ত থাকে তাকে অস্তিকায় দ্রব্য বলে। দেশে পরিব্যাপ্তির সঙ্গে পরিমাণ বা জড়ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। যা দৈশিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে তাই অস্তিকায়। অস্তিকায় দ্রব্য দু'প্রকার— জীব ও অজীব।

যে কোন চেতন দ্রব্যকে জীব বলা হয়। অন্যান্য দর্শনে যাকে আত্মা বলা হয় তাই জীব। জৈনগণ মানুষ থেকে উদ্ভিদ সকলকেই জীব বলেছেন। জীব বা আত্মা স্বরূপত সর্বজ্ঞ হলেও সমস্ত জীবের মধ্যে এই সর্বজ্ঞত্বের প্রকাশ হয় না। জৈন মতে আত্মা স্বরূপত অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্যের অধিকারী। কেবলমাত্র মুক্ত জীবের মধ্যেই এই ধর্মগুলি দেখা যায়। সংসারী জীবের এই সমস্ত ধর্ম কর্ম-পুদ্গলের দ্বারা আবৃত থাকে।

জৈন দর্শনে অনন্ত সংখ্যক জীব স্বীকার করা হয়েছে। জীব মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ বিভু বা অনু পরিমাণ নয়। জীবকে যদিও দেশে ব্যাপ্ত বলা হয়েছে তা হলেও জীব যে দেহে অবস্থান করে সেই সীমিত দেহ ব্যাপ্ত করে থাকে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবের ব্যাপ্তিরও পরিবর্তন হয়। জৈনরা মনে করেন যে গৃহকোণে স্থাপিত প্রদীপটি যেমন সমস্ত কক্ষ আলোকিত করে সেইরকম জীব বা আত্মাও দেহের সর্বত্র অবস্থান করে।

জৈনগণ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উদ্ভিদের শুধুই স্পর্শেন্দ্রিয় আছে (একেন্দ্রিয়), তাই উদ্ভিদ সর্বনিম্ন স্তরের জীব। মানুষ উচ্চতম স্তরের জীব, কারণ মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও মন আছে।

অজীব দ্রব্যকে নিষ্প্রাণ বলা হয়েছে। অজীব দ্রব্য চেতনাশূন্য। জৈন মতে অজীব পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার অজীবের নাম **পুদ্গল**। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন অচেতন মূর্ত দ্রব্যই পুদ্গল নামে অভিহিত হয়েছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ— এগুলি সবই পুদ্গলের প্রকাশ যাদের সূক্ষ্মতম রূপ হল পরমাণু। অজীবের অপর চারটি প্রকারের নাম— ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল।

বন্ধন

জৈনদর্শন অনুসারে আত্মায় যখন কর্মের প্রবেশ ঘটে তখন কর্মের সঙ্গে মিশ্রণে আত্মা

কলুষিত হয়। আত্মার এই অবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থা। জৈনদর্শনে কর্মকে একপ্রকার পুদ্গল (matter) বলা হয়েছে। কর্ম অনুপরিমাণ। কর্মের ধর্ম আত্মার ঊর্ধগুরুত্বের বিপরীত। কর্মকে জৈনদর্শনে জন্ম, মৃত্যু এবং সমস্ত ভোগের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। জীবের সংসারদশা কর্মের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। জীব এরই ফলে কীট বা পতঙ্গরূপে জন্মায়। মানুষের জাতি বা সামাজিক অবস্থানও কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। জৈন কার্যকারণতত্ত্ব অনুযায়ী কারণ মাত্রই কার্য উৎপাদন করে। সুতরাং প্রত্যেক জীবকেই তার কর্মফল ভোগ করতে হয়।

কর্মের অস্তিত্ব এবং তার ফলের সপক্ষে প্রমাণ কি? কর্মের অস্তিত্বের সপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি এই যে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্ম স্বীকার করা প্রয়োজন। অপর একটি যুক্তিতে বলা হয়েছে যে সুখ ও দুঃখকে ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের কারণরূপে শুভ ও অশুভ কর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জীবের স্বরূপগত ধর্ম হলেও আত্মায় কর্মের অনুপ্রবেশের ফলে জীবের এই গুণগুলি অপ্রকাশিত থাকে। জীবের কামনাবাসনার ফলে অজীব দ্রব্য একপ্রকার পুদ্গল আত্মায় অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে আত্মার যে অবস্থা হয় তারই নাম 'বন্ধন'।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে আত্মায় অজীব পুদ্গলের অনুপ্রবেশই বন্ধনের কারণ। আত্মা যখন পুদ্গল থেকে বিযুক্ত হয় তখনই আত্মার বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ হয়।

কিন্তু আত্মায় পুদ্গলের অনুপ্রবেশ ঘটে কেন? জৈন মতে ক্রোধ, মান, অহঙ্কার প্রভৃতি পুদ্গলকে আত্মায় আকর্ষণ করে। তবে পুদ্গলের প্রবাহের মূল কারণরূপে 'কষায়' বা মান, মোহ প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। যে পুদ্গল আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয় তাকে কর্ম পুদ্গল বলা হয়েছে কারণ এই পুদ্গল জীবের কর্মের উপর নির্ভর করে। অতএব জীবের কষায়বশত কর্ম পুদ্গল আত্মায় অনুপ্রবেশ করলে জীবের বন্ধন হয়। আত্মার স্বাভাবিক ঊর্ধ্বগুরুত্ব থাকলেও কর্মের প্রভাবে তা ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ কর্মের ধর্ম অধোগুরুত্ব। আত্মার সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ অনাদি, যদিও তার অন্ত আছে।

আত্মায় কর্মপ্রবাহের প্রবেশকে জৈন দর্শনে *'আস্রব'* বলা হয়েছে। জল যেমন প্রণালীর মধ্য দিয়ে জলাশয়ে প্রবেশ করে সেইরকম আস্রবের দ্বারা কর্ম আত্মায় আকৃষ্ট হয়।

এই দু-প্রকার আস্রবের মধ্যে ভবাস্রবের গুরুত্ব বেশি, কারণ এর প্রভাবেই কর্ম পুদ্গলের প্রবাহের সূত্রপাত হয়।

উপরে যে ভবাস্রবের কথা বলা হল তাকে জৈনরা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় এবং যোগ।

(১) 'মিথ্যাত্বে'র অর্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। যেমন, অজ্ঞতাবশত যা মিথ্যা তাকে যখন বিশ্বাস করা হয়, অথবা কোন বিষয়কে মিথ্যা বলে জানা সত্ত্বেও তাকে স্বীকার করা অথবা কোন বিষয় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়া— এ সমস্তই মিথ্যাত্বের লক্ষণ।

(২) 'অবিরতি'র অর্থ আত্মসংযমের অভাব। অবিরতি পাঁচ প্রকার— হিংসা, অনৃত, চৌর্য, অব্রহ্ম (ব্রহ্মচর্যের অভাব), পরিগ্রহাকাঙ্ক্ষা (যা প্রদত্ত হয়নি তা গ্রহণের ইচ্ছা)। এই পাঁচটিকে একসঙ্গে 'অব্রত' বলা হয়।

(৩) 'প্রমাদ' শব্দটির দ্বারা 'বিকথা' বা নিন্দনীয় কথা, ইন্দ্রিয়, নিদ্রা ও রাগ বা আসক্তিকে বোঝায়।

(৪) 'কষায়' বা মোহ— এর অর্থ আসক্তি ও জুগুপ্সার গভীর প্রকাশ ও প্রভাব।

(৫) 'যোগ' শব্দের অর্থ দেহ, মন ও বাক্যের ক্রিয়াগত সুপ্ত প্রবণতা যা ক্রমশ কর্ম পুদ্গলে পরিণত হয়।

এই পঞ্চবিধ ভবাস্রব আত্মাকে কলুষিত করে। তৈলসিক্ত বস্তুতে যেমন অন্য পদার্থ সহজেই আকৃষ্ট বা লিপ্ত হয় সেইরকম ভবাস্রবর দ্বারা কলুষিত আত্মায় কর্ম প্রবাহিত হয়।

যে কর্ম আত্মায় প্রবিষ্ট হয় তা আট প্রকার— জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ুষ্কর্ম, নামকর্ম, গোত্রকর্ম এবং অন্তরায়কর্ম।

আত্মার স্বরূপগত ধর্ম হল জ্ঞান ও তত্ত্ব গ্রহণে প্রবণতা। জ্ঞানাবরণীয় ও দর্শনাবরণীয় কর্ম জীবের ধর্মজ্ঞান ও দর্শনকে আবৃত করে। প্রথমটি জীবের জ্ঞাতৃত্ব ধর্মকে বাধা দেয় যার ফলে তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। দর্শনাবরণীয় কর্ম জীবকে দর্শনে বাধা দেয়। তত্ত্বোপদেশের গ্রহণের নাম দর্শন। এই গ্রহণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে দর্শনাবরণীয় কর্ম। মোহনীয় কর্ম জীবকে এতই মোহাচ্ছন্ন করে যে জীব ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভের প্রভেদকে বোঝে না। এর ফলে তত্ত্বজ্ঞানে অনীহা সৃষ্টি হয়। বেদনীয় কর্ম সুখ ও দুঃখের অনুভবকে বোঝায়। আয়ুষ্কর্ম জীবের সঙ্গে দেহকে সংযুক্ত করে। নাম ও গোত্রকর্ম জীবের নামকরণ ও উচ্চ-নীচ অবস্থানের কারণ। অন্তরায় কর্ম জীবের সৎকর্মের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

মুক্তি— জীবকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করাই জৈন ধর্মের উদ্দেশ্য।

মুক্তির জন্য প্রয়োজন কর্মের বিনাশ। জৈনরা মুক্তির জন্য দুটি প্রধান উপায়ের উল্লেখ করেন— সম্বর ও নির্জরা।

সম্বর— সম্বর আস্রবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মার কর্মপ্রবাহের প্রবেশকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। সম্বরের ফলে আত্মায় কর্মের প্রবাহ রুদ্ধ হয়। এইভাবে সম্বর জীবের স্বাভাবিক ধর্মাবলীকে প্রকাশ করে আত্মার স্বরূপ উন্মোচনে সাহায্য করে।

জৈনদর্শনের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করা তাই এই দর্শনে সম্বর অত্যন্ত মূল্যবান। আস্রব জীবের স্বাভাবিক মুক্ত স্বভাবকে আবৃত করে। সম্বর আত্মার স্বাভাবিক ধর্মকে প্রকাশ করে। জৈনদর্শনে নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্বরকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়—

(১) অমিথ্যাত্ব

(২) বিরতি

(৩) কষায়

(৪) অপ্রমাদ

(৫) অযোগ

এগুলি সবই আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি। এর ফলে আত্মায় কর্ম পুদ্গলের প্রবাহ রুদ্ধ হয়।

নির্জরা— সম্বর কর্মের প্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারে; কিন্তু আত্মায় যে কর্ম প্রবিষ্ট ও সঞ্চিত হয়ে থাকে তার বিনাশ না হলে জীবের মোক্ষ লাভ হয় না। সঞ্চিত কর্মের বিনাশই নির্জরা। তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির মাধ্যমে জীবের মধ্যে সঞ্চিত কর্ম পুদ্গলের বিনাশ হয়। নির্জরা দু-প্রকার— ভাব নির্জরা ও দ্রব্য নির্জরা। আত্মার যে অবস্থা আত্মা ও কর্ম পুদ্গলের বিযুক্তির পক্ষে উপযোগী তাকে ভাব নির্জরা বলে। আত্মা ও কর্মের বাস্তব বিচ্ছেদকে দ্রব্য নির্জরা বলা হয়েছে।

কর্ম দু-ভাবে বিনষ্ট হয়— (১) কর্মফলের ভোগের সমাপ্তির দ্বারা এবং (২) তপস্যার দ্বারা।

(১) প্রথম প্রক্রিয়াটির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কর্ম বিনষ্ট হয়। কারণ কর্মফল চিরস্থায়ী নয়; তার বিনাশ অনিবার্য। যেহেতু কর্মের বিনাশের এই প্রক্রিয়ায় কোন মানুষকে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হয় না তাই একে 'অকাম নির্জরা' বলে। কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে সমস্ত জীবের কর্মই স্বাভাবিকভাবে একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং সকলেই মুক্তি লাভ করবে। কারণ স্বাভাবিক নিয়মে কর্ম পুদ্গলের বিনাশ হলেও নতুন করে কর্ম আত্মায় মিশ্রিত হতে পারে। তাই আর কোন কর্ম যাতে আত্মায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

(২) কঠোর তপস্যার ফলে সঞ্চিত কর্ম ফল দান না করেই অন্তর্হিত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে 'সকাম নির্জরা' বলে।

বন্ধনদশাকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে দুধ ও মাখন যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তিল ও তৈল যেমন মিশ্রিত থাকে, সেইরকম বন্ধন দশায় জীব ও কর্ম মিশ্রিত থাকে। তিলকে পিষ্ট করলে যেমন তার থেকে তৈল মুক্ত হয় বা তিলের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসে, মন্থনের ফলে যেমন দুধ থেকে মাখন নির্গত হয়,

সেইরকম আত্মসংযম ও তপস্যার দ্বারা আত্মা কর্ম পুদ্গল থেকে মুক্ত হয় ও মোক্ষ লাভ করে।

বন্ধনের অবসান হলে আত্মা তার স্বাভাবিক ধর্ম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দৃষ্টি, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ লাভ করে। এই মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জৈন দর্শনে অতি কঠোর প্রস্তুতির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মোক্ষ লাভের উপায় এতই কঠোর যে কেবলমাত্র একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেই সেই পথ অনুসরণ করা সম্ভব। তার কারণ মোক্ষলাভের জন্য যে নিষ্কাম, নিরাসক্ত জীবনের প্রয়োজন তা একমাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের পক্ষে জগৎ সংসার সম্বন্ধে নির্মোহ অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়।

জৈন নীতিদর্শনে মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বা পরম নৈতিক আদর্শরূপে দেখা হয়েছে। মোক্ষমার্গ নির্দেশ করাই জৈন নীতিদর্শনের উদ্দেশ্য। মোক্ষলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির নানা প্রকার পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে **রত্নত্রয়** বা **ত্রিরত্ন** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্রকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। এই মোক্ষমার্গ ভাগবতের ভক্তিমার্গ, বেদান্তীর জ্ঞানমার্গ এবং মীমাংসার কর্মমার্গ থেকে ভিন্ন। এই সমস্ত সম্প্রদায় ভক্তি অথবা জ্ঞান অথবা কর্মকে মোক্ষের সহায়ক বলে মনে করেন। কিন্তু জৈনমতে মুমুক্ষু ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটিই একত্রে থাকা প্রয়োজন। জৈনদর্শনের ভাষ্যকারগণ এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে চিকিৎসায় সুফল লাভের জন্য প্রয়োজন ওষুধের কার্যকারিতায় বিশ্বাস, তার ব্যবহার রীতি এবং তার প্রয়োগ। চিকিৎসায় ফললাভ হয় যদি এই তিনটি একই সঙ্গে থাকে। সাংসারিক দুঃখভোগজনিত ব্যধিরও উপশম হতে পারে যদি সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্র এই রত্নত্রয় উপস্থিত থাকে। কোন একটির অনুপস্থিতিতে অপর দুটি নিষ্ফল হয় যদিও প্রত্যেকটির নিজস্ব মূল্য আছে।

এই ত্রিরত্নের মধ্যে সম্যক জ্ঞান বিশেষ মূল্যবান কারণ অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতো জৈনরাও মনে করেন যে অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। জীব বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে বদ্ধ করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত শুধুমাত্র তপস্যা অজ্ঞান বা অজ্ঞানজনিত দুঃখ দূর করতে পারে না। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য প্রথমে শ্রদ্ধাশীল হয়ে তীর্থঙ্করদের উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। তাই ত্রিরত্নের মধ্যে প্রথমে সম্যক দর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। তীর্থঙ্করদের উপদেশই সম্যক জ্ঞানের জন্ম দেয়। এখানে ত্রিরত্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল—

সম্যকদর্শন— জৈন দর্শন এবং তার ভিত্তিস্বরূপ তীর্থঙ্করদের উপদেশে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাসই সম্যকদর্শন। জৈন দার্শনিকরা বলেছেন যে এই শ্রদ্ধা কোন কোন মানুষের মধ্যে সহজাত হতে পারে, আবার উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবেও মানুষ জৈন শাস্ত্রের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধা ব্যতীত যে জ্ঞান হয় না এ বিষয়ে সমস্ত জৈন সম্প্রদায় একমত।

সুতরাং সম্যকদর্শন প্রকৃতপক্ষে জৈনশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু যে শ্রদ্ধা বিচারবিযুক্ত তাকে জৈনরা যথার্থ শ্রদ্ধা বলে মনে করেন না। জৈনরা কখনও একথা বলেন না যে জৈন শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতেই হবে এবং অন্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতেই হবে। যা যুক্তিগ্রাহ্য তাকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। বিচারের সঙ্গে শ্রদ্ধার কোন বিরোধ নেই, বরং যা বিচারসিদ্ধ তাই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে শাস্ত্রে প্রবেশ করা যায় না। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে তোলে। শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থবোধের সহায়ক।

অবিচল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জন্য মানুষকে ত্রিবিধ কুসংস্কার এবং তজ্জনিত অজ্ঞান ও আট প্রকার দম্ভ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ত্রিবিধ কুসংস্কারকে ত্রিবিধ মূঢ় বলা হয়েছে— লোক মূঢ়, দেবমূঢ় এবং পাষণ্ডী মূঢ়। লোকমূঢ় মানুষের কতকগুলি বিশেষ লৌকিক বিশ্বাসকে বোঝায়— যেমন একটি বিশেষ নদীতে স্নান করলে মানুষ পবিত্র হয়। দেবমূঢ় দেবতাদের শক্তিমত্তায় বিশ্বাসকে বোঝায়। মানুষ বিশ্বাস করে যে দেবতাদের তুষ্ট করলে নানা স্বার্থসিদ্ধি হয়। পাষণ্ডী মূঢ় ভণ্ড সাধুদের কথায় বা উপদেশে বিশ্বাসকে বোঝায়। এই ত্রিবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্তি সম্যক দর্শনের আবশ্যিক শর্ত। তাছাড়া জৈন নীতিশাস্ত্রে বিনয়কেও মোক্ষলাভের অন্যতম শর্ত বলা হয়েছে। মানুষকে তাই আট প্রকার দম্ভ থেকে মুক্ত থাকতে হবে— বুদ্ধিমত্তার দম্ভ, বিশালাকারে পূজা করার সামর্থ্যের দম্ভ, বংশাভিমান জনিত দম্ভ, জাতির দম্ভ, মানসিক, শারীরিক ও অলৌকিক শক্তির দম্ভ, যোগক্রিয়ার দম্ভ, রূপের দম্ভ। এইভাবে কুসংস্কারমুক্ত মানুষ ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে।

সম্যকজ্ঞান— আত্মজ্ঞানকেই সম্যকজ্ঞান বলা হয়েছে। জীব ও অজীবের স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত ও বিশদ জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলে। জীব যখন কর্ম পুদ্গলকে আকর্ষণ করে তখন জ্ঞান অপ্রকট হয়। সম্বর ও নির্জরা যখন জীবকে পুদ্গল মুক্ত করে তখনই আত্মবিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়। সম্যক জ্ঞানকে 'কেবল জ্ঞান' বলা হয়।

সম্যক চারিত্র— মোক্ষলাভের সহায়ক কর্ম পালনকেই সম্যক চারিত্র বলে। সাধুদের জন্য জৈন নীতিদর্শনে সে পঞ্চমহাব্রতের উপদেশ করা হয়েছে সেই ব্রতের অনুষ্ঠানের ফলে সম্যক চারিত্র লাভ করা যায়।

মহাব্রত ও অনুব্রত— জৈন নীতিদর্শন মোক্ষকে একই সঙ্গে নৈতিক আদর্শ ও পরমপুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। এই আদর্শে পৌঁছানোর পথ অতি দুর্গম। জৈন নীতিশাস্ত্রে তাই দু-প্রকার নৈতিক অনুশাসনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুশাসনগুলিকে ব্রত বলা হয়। তবে ব্রতের অনুশীলন ব্যক্তির সামর্থ্যের উপর

নির্ভর করে। এই ব্রত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত— কিছু কিছু ব্রত সাধারণ মানুষ বা শ্রাবকের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, আবার কিছু ব্রত শ্রমণ, ভিক্ষু বা নিগ্রন্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। অনিকেত সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের জন্য নানা কঠোর ব্রতের উল্লেখ থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য যে ব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনেকটাই সরল এবং তুলনামূলকভাবে অনায়াসসাধ্য। তবে উভয় ব্রতের ক্ষেত্রেই অহিংসাই যে মূল ভিত্তি তা বোঝা যায়। সন্ন্যাসীদের পালনীয় ব্রতকে **মহাব্রত** বলা হয়। সাধারণ মানুষের পালনীয় ব্রতের নাম অনুব্রত। আসলে মহাব্রত ও অনুব্রতের মধ্যে পার্থক্য শুধুই মাত্রাগত। কঠোরতার মাত্রাভেদে একই ব্রত মহাব্রত ও অনুব্রত নামে অভিহিত হয়।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যখন কঠোর ভাবে শ্রমণদের জন্য অনুমোদিত হয় তখন তাদের একত্রে পঞ্চমহাব্রত বলা হয়। এই পাঁচটি ব্রতের মধ্যে অহিংসাই প্রধান এবং সর্বাধিক মূল্যবান।

অহিংসার অর্থ সবরকম হিংসা থেকে বিরতি। প্রাণীর প্রতি দৈহিক আঘাতকেই জৈনরা হিংসা বলে মনে করেননি। জৈন মতে মানসিকভাবে অন্যের অনিষ্ট কামনা করা বা বাক্যের দ্বারা আঘাত করাও হিংসা। সুতরাং কায়িক, বাচিক ও মানসিক— এই ত্রিবিধ হিংসা থেকে বিরত থাকাই 'অহিংসা' শব্দের অর্থ।

একজন জৈন ভিক্ষু যখন অহিংসা ব্রত পালন করেন তখন তিনি কায়িক, মানসিক এবং বাচিক— কোনভাবেই কোন প্রাণীর ক্ষতিসাধন করেন না। অহিংসার নীতিকে এই তিনভাবে পালন করাকে তিনপ্রকার গুপ্তি বলা হয়েছে— কায়িক অহিংসার গুপ্তি বা নীতি, মানসিক অহিংসার গুপ্তি এবং বাচনিক অহিংসার গুপ্তি।

জৈন নীতিদর্শনে অহিংসাই পরম ধর্ম, কারণ অন্যান্য চারটি মহাব্রত পরোক্ষভাবে অহিংসাকেই পালন করে। জৈনদর্শনে পঞ্চমহাব্রতের উল্লেখ দেখা যায়— **অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য** ও **অপরিগ্রহ**। এদের মধ্যে অহিংসাকে প্রধান বলার কারণ এই যে অন্যান্য ব্রতগুলিতেও অহিংস আচরণ করারই নির্দেশ আছে। যেমন দ্বিতীয় মহাব্রত সত্য প্রকারান্তরে অহিংসা পালনের ব্রত। কারণ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যাভাষণ সেই ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়। অসত্য বাচিক হিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'অস্তেয়' বা পরদ্রব্য অপহরণ করা থেকে বিরত না থাকলেও হিংসাচার হয়, কারণ যে ব্যক্তি সেই দ্রব্যের প্রকৃত অধিকারী এর ফলে তার মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়। 'ব্রহ্মচর্য' থেকে বিরতি অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। 'অপরিগ্রহ' শব্দের অর্থ দান গ্রহণ না করা এবং তার দ্বারা অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী না হওয়া। যদি কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য সঞ্চয় করে তাহলে তার এই প্রবৃত্তির ফলে অন্য

মানুষের অভাব বৃদ্ধি পায়। অপরকে বঞ্চিত করাও এক প্রকার হিংসা। তাই অপরিগ্রহ একপ্রকার অহিংস আচরণ।

জৈন নীতিদর্শন অনুযায়ী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর আচরণ সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে জৈন ভিক্ষুকে পাঁচটি মহাব্রত ছাড়াও নিম্নলিখিত পাঁচটি 'সমিতি' বা অনুনীতি পালন করতে হবে। যেমন,

(১) ইর্যা সমিতি— চলার সময় কোন প্রাণীর যাতে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা।

(২) ভাষা সমিতি— বাচনিক আঘাত যাতে না হয় সেইজন্য কথার উপর সংযম আবশ্যক।

(৩) এষণা সমিতি— খাদ্য বিষয়ে বিশেষভাবে নিশ্চিত হওয়া যে সেই খাদ্য শুধু তার জন্যই প্রস্তুত করা হয়নি।

(৪) আদান নিক্ষেপণ সমিতি— প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে কারও আঘাত না লাগে।

(৫) পরিথাপানিকা সমিতি— অপ্রয়োজনীয় বস্তু সাবধানতার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া।

এই পাঁচটি সমিতি ভিক্ষুকে অহিংসা ব্রত পালনে সাহায্য করে। সমিতিগুলির অনুশাসন অতি কঠোর— কারণ এর উদ্দেশ্য হল আসক্তি ও ঘৃণা ত্যাগ করা। সম্পূর্ণ অহিংসা পালন না করলে কখনও মোক্ষ লাভ করা যায় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন প্রাণীর সংরক্ষণই অহিংস আচরণের মূল কথা। তাই পাখিকে পিঞ্জর মুক্ত করা অথবা আহত পশু-পাখির পরিচর্যাকে অহিংসা ব্রতের অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করা হয়।

এর ফলে অহিংসাকে নিছক সমবেদনার নামান্তর বলে মনে হতে পারে। জৈনদের কোন কোন শাখা অহিংসার একটি চরম অর্থ গ্রহণ করেছেন। এই অর্থ অনুসারে যে কোন প্রকার হিংসাই বর্জনীয়। যে কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা অনৈতিক এবং তা মোক্ষের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অহিংসা এবং সত্যকে জৈনরা (থেরাপন্থী) এত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন যে কোন মানুষের পক্ষেই যথার্থ অহিংস আচরণ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। থেরাপন্থীরা পরিহার্য ও অপরিহার্য হিংসার মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করেন না। যে কোন পরিস্থিতিতেই তাঁরা হিংসাকে নিন্দনীয় বা অনৈতিক বলেছেন।

প্রতিটি মহাব্রতের সঙ্গে জৈনগণ পাঁচটি করে ভাবনা যুক্ত করেন—

অহিংসায় সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি ভাবনা হল— (১) কোন জীবের যাতে ব্যথা বা ক্লেশ না হয় সেজন্য সংকীর্ণ সীমার মধ্যে গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা; (২) মোহ, ঘৃণা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত সর্বপ্রকার চিন্তা বর্জন করা যাতে মানসিক শান্তি বিরাজ করে;

(৩) আহার্য বস্তুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং বাক্ সংযম করা; (৪) যে কোন বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা; (৫) যথাসময়ে দিবালোকে যথাযথ ভাবে পরীক্ষার পর খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা।

সত্যের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি ভাবনা হল— (১) শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং প্রচলিত সৎ রীতি অনুযায়ী সত্য ভাষণ করা; (২) ক্রোধ পরিত্যাগ করা; (৩) লোভ ত্যাগ করা; (৪) ভীতি পরিত্যাগ করে নির্ভয় হওয়া; (৫) হাস্য পরিহার করা।

অস্তেয়ের সঙ্গে জড়িত ভাবনা হল— (১) কেবলমাত্র সেই সমস্ত বস্তু গ্রহণ করা যা হিংসার দ্বারা উৎপন্ন নয়; (২) সর্বদাই এই জাতীয় বস্তু গ্রহণ করা; (৩) একজনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটাই গ্রহণ করা; (৪) সমান মানসিকতায় মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ বা ভিক্ষা করা; (৫) দাতার অনুমতি সাপেক্ষে দান গ্রহণ করা।

ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে জড়িত ভাবনাগুলি হল— নারী, পশু ও নপুংসকের দ্বারা ব্যবহৃত আসন ব্যবহার না করা; (২) মোহযুক্ত হয়ে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা না করা; (৩) এমন কোন দৈহিক আচরণ না করা যা নারীকে আকর্ষণ করতে পারে; (৪) যে নারীকে পূর্বে ভোগ করা হয়েছে তাকে বিস্মৃত হওয়া; (৫) এমন খাদ্যবস্তু গ্রহণ না করা যা যৌন প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করতে পারে।

অপরিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি ভাবনা হল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ গুণের আশ্রয় সমস্ত পদার্থের প্রতি নির্মোহ থাকা অর্থাৎ তাদের প্রতি কামনা ও ঘৃণাশূন্য হওয়া।

সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্রতগুলি সম্পূর্ণ ভাবে ও যথাযথ ভাবে পালন করা সম্ভব নয়। উল্লিখিত মহাব্রতগুলির কঠোরতার পরিপ্রেক্ষিতে জৈন নীতিশাস্ত্রে তাদের শুধুই শ্রমণদের পালনীয় বলা হয়েছে। প্রতিটি মহাব্রতকে শিথিল করে যে নৈতিক বিধি রচনা করা হয় তা গৃহস্থদের পক্ষে উপযোগী এবং জৈন নীতিশাস্ত্রে তাদের অনুব্রত বলা হয়েছে। সুতরাং জৈন নীতিশাস্ত্রে যাকে অনুব্রত বলা হয়েছে তা মহাব্রতেরই সরল ও ক্ষুদ্র সংস্করণ। হিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি মহাব্রতকে অনুসরণ করে বিভিন্ন নমনীয় কর্মনীতির সংগ্রহ অনুব্রতের অন্তর্গত।

অনুব্রত রূপে অহিংসা— মহাব্রত রূপে অহিংসা একটি অতিকঠোর অনুশাসন। অনুব্রতরূপে অহিংসাকে শিথিল বা নমনীয় করা হলেও জৈনদের কোন কোন শাখা অহিংসার একমাত্র চরম অর্থটিকেই গ্রহণ করেন। এই অর্থ অনুসারে যেকোন প্রকার অহিংসাই বর্জনীয় কারণ তা মোক্ষের পথে বাধা সৃষ্টি করে। জৈনরা, বিশেষত থেরাপন্থীরা, অহিংসাকে এত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই যথার্থ অহিংস আচরণ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। থেরাপন্থীরা পরিহার্য ও অপরিহার্য হিংসার মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করেন না। যেকোন পরিস্থিতিতেই তারা হিংসাকে নিন্দনীয় বা অনৈতিক বলেছেন।

সাধারণ মানুষের পক্ষে এরকম অহিংসা পালন করা সম্ভব নয়। সেজন্য অহিংসার অনুশাসনকে অনেক শিথিল করে সাধারণ মানুষের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে।

অনুব্রত রূপে অহিংসার অর্থ হল "স্থূল-প্রাণাতি-পাত বিরমণ" অর্থাৎ স্থূল হিংসা থেকে বিরতি। এর অর্থ হল উচ্চতর প্রাণী হত্যা থেকে বা প্রাণীকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা। যে প্রাণী একাধিক ইন্দ্রিয়ের অধিকারী তাকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত বলা হয়। এরকম একাধিক ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণীকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা স্থূল হিংসা থেকে বিরতি। গৃহস্থদের পক্ষে সূক্ষ্ম হিংসা অর্থাৎ নিম্নবর্ণের প্রাণীহিংসা থেকে বিরত থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। একথার একটি তাৎপর্য এই যে পশু মাংস আহার করা গৃহস্থদের পক্ষেও নিষিদ্ধ।

মহাব্রতের অন্তর্গত 'অহিংসা'কে গৃহস্থের উপযোগী করে নিম্নলিখিত ছয়টি অনুব্রতের উল্লেখ করা হয়—

(১) ইচ্ছাপূর্বক নির্দোষ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা;

(২) আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকা;

(৩) ভ্রূণহত্যা থেকে বিরত থাকা;

(৪) এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না থাকা যার উদ্দেশ্য হিংসা ও ধ্বংস;

(৫) মানুষকে অস্পৃশ্য জ্ঞান না করা;

(৬) সমস্ত প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা থেকে বিরতি।

অনুব্রতরূপে সত্যের অর্থ 'স্থূল-মৃষা-বাদ-বিরমণ।' মিথ্যাকে স্থূল বলা হয় যখন মিথ্যা উক্তি অন্যের ক্ষতিকারক হয়। মিথ্যাকে সূক্ষ্ম বলা হয় যখন কথা ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি থাকে না। অনুব্রতীর পক্ষে স্থূল মিথ্যাভাষণ থেকে বিরত থাকাই কাম্য।

জৈন নীতিশাস্ত্রে সত্যের সঙ্গে যুক্ত ছয়টি অনুব্রতের উল্লেখ করা হয়—

(১) ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যথাযথ পরিমাণ দেওয়া;

(২) সচেতনভাবে মিথ্যা অভিমত না দেওয়া;

(৩) মিথ্যা মামলা না করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া;

(৪) অন্যের গোপন তথ্য প্রকাশ না করা;

(৫) গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করার অনিচ্ছা প্রকাশ না করা;

(৬) জাল বা প্রতারণা না করা।

অনুব্রতরূপে অস্তেয়ের অর্থ 'স্থূল-অদত্তাদান-বিরমণ' বা চৌর্যকে বোঝায়। যেমন, কারও গৃহ থেকে তারই সম্পদ অপহরণ করাকে স্থূল চৌর্য বলা হয়। কিন্তু তৃণক্ষেত্র থেকে তৃণ নেওয়া সূক্ষ্ম চৌর্য কারণ তার জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাই সূক্ষ্ম চৌর্যকে অনুমোদন করা হয়েছে।

'অস্তেয়' সম্পর্কে অনুব্রত পাঁচটি—

(১) পরদ্রব্য অপহরণ না করা;

(২) অপহৃত দ্রব্য ক্রয় না করা বা ক্রয়ে সাহায্য না করা;

(৩) আইন বিরোধী বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা;

(৪) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসামাজিক কার্যকলাপ না করা;

(৫) একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পক্ষে সেই প্রতিষ্ঠানের অর্থ বা সম্পত্তি আত্মসাৎ না করা।

অনুব্রত রূপে ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য-কে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচর্যের অর্থ 'স্বদার-সন্তোষ' বা 'স্বপতি-সন্তোষ' অর্থাৎ নিজের স্ত্রী বা স্বামীতে সন্তুষ্টি। নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে পরিমিত বা সংযত যৌন সম্পর্কই কাম্য। অন্য নারী বা পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক কঠোর ভাবে নিন্দিত হয়েছে।

'ব্রহ্মচর্য' সম্পর্কিত অনুব্রত পাঁচটি—

(১) ব্যভিচার না করা;

(২) অস্বাভাবিক যৌন কর্মে লিপ্ত না থাকা;

(৩) যৌন ক্রিয়া থেকে নিয়মিত বিরতি;

(৪) আঠার বছর পর্যন্ত বিবাহ না করা;

(৫) অধিক বয়সে বিবাহ না করা।

অনুব্রতরূপে অপরিগ্রহের অর্থ 'ইচ্ছা পরিণাম' বা 'পরিগ্রহ পরিণাম' যার অর্থ হল ইচ্ছা এবং অধিকার সঙ্কোচন। এই ব্রত মানুষকে অর্থ, স্বর্ণ, ভূমি প্রভৃতির উপর অধিকারকে সীমিত করতে বলে।

'অপরিগ্রহ' সংক্রান্ত অনুব্রত পাঁচটি—

(১) স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু অধিকার না করা;

(২) উৎকোচ এমনকি উপহার পর্যন্ত গ্রহণ না করা;

(৩) নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থ না দেওয়া বা না নেওয়া;

(৪) চিকিৎসকের পক্ষে লোভবশত রোগীর চিকিৎসা দীর্ঘায়িত না করা;

(৫) বিবাহে যৌতুক দাবি না করা।

অনুব্রতগুলি আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক হলেও এই ব্রতগুলি পালন করলে নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়। এর ফলে একদিকে আত্মশুদ্ধি হয়, অপরদিকে আদর্শ চরিত্র গঠিত হয় যা মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যায়।

অহিংসা জৈন নীতিশাস্ত্রের অন্যতম আদর্শ হলেও এই বিষয়ে অনাবশ্যক কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়নি। অহিংস আচরণ সম্পর্কে জৈনদের নমনীয় মনোভাব তাদের ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। অনুব্রতগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে সেখানে অহিংসাকে অতি ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়নি। এর ফলে কৃষিকাজ অথবা

অন্যান্য বৃত্তিজনিত প্রাণী হত্যাকে হিংসা বলে গণ্য করা হয়নি। গার্হস্থ ধর্ম পালনের জন্য কিছু কিছু হিংসা অপরিহার্য। যেমন যারা মৎস্যজীবী অথবা যারা পশুপালন করে তাদের পক্ষে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। এই অপরিহার্য প্রাণী হত্যা জৈন নীতিশাস্ত্রে অনুমোদন লাভ করেছে। তাছাড়া আত্মরক্ষার স্বার্থে যখন অন্যকে আঘাত বা হত্যা করা অপরিহার্য হয় তখন তাকে হিংসা বলা যায় না। শুধুমাত্র যে হিংসা পূর্বপরিকল্পিত তাকেই জৈন নীতিশাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়নি। অন্যান্য হিংসা যা বিভিন্ন কারণে অপরিহার্য তাকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকার করা হয়েছে।